টান

সাথী মুখার্জ্জী

বাড়ি ফিরে একটা চিঠি পেলাম। আমার কাজের লোকটি দিয়ে গেল। হাতে নিয়ে দেখলাম বাবা লিখেছেন। দুই লাইনের লেখা। - তোমাদের পিসি অসুস্থ, শিঘ্রী আসিবার ব্যবস্থা করো।চিঠিটা পেয়ে একইসাথে অবাক ও দুশ্চিন্তা দুটোই হলো। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রায় দশদিন মত বাড়ীতে ফোন করা হয়নি। এর মধ্যে কি এমন হল? আমার বাবা একটু প্রাচীনপন্থী। এই জেট গতির যুগেও ফোন না করে চিঠি লিখতেই পছন্দ করেন। কম কথার মানুষ। আমরা কিছু বললে বলেন, - আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। তাই বাবা কাছে থেকেও দূরের ছিলেন। তবে কোনোদিন কর্ত্তব্যে অবহেলা ছিলনা। ছোটোবেলায় মা মারা যাবার পর শুভার্থীরা বাবাকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। বাবা সে পথ মারাননি। আরও বেশী করে নিজেকে পড়াশোনার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজ আর বাড়ী এই ছিল বাবার ধ্যান জ্ঞান। ভাবুক অধ্যাপক বাবাটি কলেজে সবার প্রিয়। মা মারা যাবার পর পিসি আমাদের দুই ভাই-বোন কে বুক দিয়ে আগলায়। পিসি খুবই দাপুটে। আবার স্নেহও পেয়েছি তার কাছ থেকে উজার করে। আমাদের কথা ভেবে নিজে বিয়ে পর্যন্ত করল না। আমি আর দাদা পিসির হাতেই মানুষ। দাদার কথা মনে পড়তে খেয়াল হলো - দাদা জানে খবরটা? সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে ফোন ঘোরালাম। একচান্সে লাইনও পেলাম -

- হ্যালো দাদা, আমি তনি বলছি।
- বুঝেছি, এই ফাটা কাঁসারের গলা আর কার হবে।
- দাদা ইয়ার্কি রাখ। বাবার চিঠি পেয়েছিস?
- না তো। হঠাৎ বিগবস্ চিঠি লিখবে কেন?

দাদাটা এইরকম। সবকিছু নিয়ে ইয়ার্কি করবে। বললাম, - পিসির অসুখ, তাড়াতাড়ি যেতে লিখেছে।

মুহূর্ত্তে দাদা সিরিয়াস।

- কি হয়েছে, কিছু লিখেছে? বাড়ীতে ফোন করেছিলি?

পলকে আমার একহাত লম্বা জিভ। - এই যাঃ । একেবারে ভুলে গিয়েছি। ভাবলাম তোকে আগে ফোন করি।

- তোর মাথায় এক ফোঁটা গ্রে মেটার নেই রে। কি করে চাকরী করিস? আমি করে তোকে জানাচ্ছি।

দিল্লী থেকে রাজধানী একটু লেট করেই ছাড়ল। আমি পিসির কথা ভাবছিলাম। কতদিন পর দেখব পিসিকে। হ্যাঁ, প্রায় একবছর হবে। নিশ্চন্ত হওয়া যায় একটা কথা ভেবে, পিসির জ্বর হয়েছিল। এখন ভালো আছে। দাদা খবরটা দেওয়ার পরপরই আমরা ঠিক করি, অনেকদিন কলকাতা যাওয়া হয়নি। এইসুযোগে বাড়ী ঘুরে আসা হবে। আর আমাদের দুজনকে এক সাথে দেখলে বাবা, পিসি দুজনেরই ভালো লাগবে। পিসির অসুখ ততটা শরীরের নই, যতটা মনের। আমরা দুই ভাইবোন পিসির প্রাণ। দুজনেই চাকরীর দায়ে কলকাতার বাইরে। আমাদের দেখতে না পেয়ে পিসির বুক ফাটছে। মুখে রা নেই। বাবা স্বল্পভাষী। দিনে কটা কথাই বা তার সাথে হয়্। যত আড্ডা, গল্প আমাদের তিনজনের মধ্যে হতো।

রোজ সকালে আমরা তিনজন জগিং করতে বের হতাম। পিসির কড়া হুকুম ছিল, পাঁচটার মধ্যে সবাইকে উঠে পড়তে হবে। রেডি হয়ে একটু দূরে পার্কে আমাদের দৌর শুরু হতো। পিসি প্রায় ছফুটের মতো লম্বা, আর তেমনি স্বাস্থ্য। এরসময় নিয়মিত বাস্কেটবল খেলত। শরীর সম্বন্ধে ভিষণ সচেতন। দাদাটা সকালে উঠতে চাইতনা। পিসি একবার ওর গায়ে একবালতি জল ঢেলে দিয়েছিল। আমরা কয়েক পাক দিয়ে হাঁপিয়ে যেতাম। পিসি বুঝত, বলত - তোরা বস। আমি আর একটা পাক দিয়ে আসি। দাদার একটা ঢোলা ট্র্যাকস্যুট পরে প্রথমদিন দৌড়াতে যাবার আগে লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল - যাঃ, কি করে বেরহব এই পরে? দাদা বলল, ফাটাফাটি লাগছে পিসি। লোকে মুর্ছা যাবে। মুর্ছা যাবার কথা শুনে অপ্রস্তত মুখে বলল - বাইরে বের হওয়া যাবেনা বলছিস? আমি হইহই করে উঠলাম - দারুন লাগছে পিসি। এমন ফিগার আর কজনের আছে?

সেইথেকে এই নিয়ম চলছে। জগিং করে বাজার সেরে বাড়ী ফেরা। মোড়ের সত্যনারায়ন মিস্টান্ন ভান্ডারে এসময় গরম গরম সিঙ্গারা আর জিলিপি ভাজে। দাদা একদিন একঠোঙা গরম জিলিপি কিনে আমাদের কাছে এসে বলল - একটা খেয়ে দেখ। গরম ভাজিয়ে আনলাম। পিসি মাছ কেনায় ব্যস্ত। আমাদের খেয়াল করেনি। পরে ঠোঙাটার দিকে চোখ পড়তে - কি খাচ্ছিস রে? পলকে দাদার হাত থেকে ঠোঙা পিসির হাতে। হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল, রাস্তার উপর দোকান, কবেকার বাসি তেলে ভাজা। আমার ভাইপো ভাইঝি হয়ে, এই খেয়ে আহ্লাদে ন্যাচছিস? এখনি পেট খারাপ হবে। দাদা হাতের অবশিষ্ট জিলিপিটা তাড়াতাড়ি মুখে চালান করল। পাছে পিসির ওটার ওপর চোখ পরে। ঠোঙাটা পিসি সামনের রাস্তায় ফেলে দিল। একটা কুকুর কোথা থেকে এসে পিসির দিকে গদগদ মুখে তাকিয়ে জিলিপিগুলো খেতে শুরু করল। দাদা একবার করুন মুখে রাস্তায় পরা জিলিপি গুলোর দিকে তাকালো।

- আমি বাড়ীতে বানিয়ে তোদের খাওয়াব। পিসি স্বান্তনা দিল।

পিসিকে বলা যাবেনা যে বাড়ীর তৈরী জিলিপিতে বাইরের দোকানের স্বাদ পাওয়া যায়না। বাড়ী ফিরে হরলিকস্ খেয়ে আমরা পড়তে বসতাম। দাদা খুবই ভালো ছাত্র ছিল। নিজেই সব বুঝে করে নিতে পারত। আমি পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হতাম। রান্নাঘদ্রর পিসির পায়ের কাছে ঘুরঘর করতাম - আমি তোমায় আলুটা কেটে দিয় পিসি?

- তুই আবার এখানে কেন? তোর পড়া নেই।
- ভাবলাম তুমি একা একা সব করছ।

পিসি কিছু করতে দিতনা। পড়া নস্ট হবে বলে। সব একাহাতে করত। একজন কাজের লোক ছিল। রান্নাটা পিসিই করত। বাবার জন্য হালকা মশলা দেওয়া রান্না, আমরা মশলাদার রান্না পছন্দ করি। আমার কাঠি আলু ভাজা চাই। দাদার গোলগোল আলু না ভাজলে খাবেইনা। প্রতিদিন একই কাজ। জগিং, বাজার, রান্না করা, আমাদের পড়ানো। কিন্ত কোনো ক্লান্তি নেই। একঘেয়েমি নেই। কেমন একটা ছন্দ আছে। পিসি খুব চাইত আমরা পড়শোনাই যেন ফাঁকি না দিই। বলত, - লেখা পড়াই ভালো না হলে, কোথাও সন্মান পাবিনা। জীবনে এই জিনিষটার খুবই প্রয়োজোন। পিসি একটা স্কুলে পড়াতেন, আমাদের কথা ভেবে চাকরীটা ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন। আমরাই বুঝিয়ে নিরস্ত করেছি। এই বাজারে চাকরি ছাড়লে আর একটা পাওয়া যাবে? তার ওপর সরকারি চাকরি। দোতলার দুটো ঘরের একটাতে বাবা থাকতেন বইপত্র সহ। অন্যঘরটাতে দাদা পিসিকে থাকতে বলেছিল। পিসি চোখটা নাচিয়ে বলেছিল - আর তোরা দুজন কোথায় থাকবি?

- আমরা যেমন নিচের ঘরে থাকি তেমন থাকব। তুমি আরামে ওপরে থাকবে।
- মতলবটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে? তোর না তনির?
- কিসের মতলব?
- আমাকে উপরে তুলে দু-ভাইবোনে নিচে ভুতের নৃত্য করবে? ওসব চিন্তা ছাড়। আমি যেমন নিচে থাকি, তেমন থাকব। তোমাদের কারও অসুবিধা হলে তোমরা ওপরে যাও। আমার তো মনে হয়, বলে দাদার দিকে চোখটা স্থির হলো - তোরই ওপরে থাকা উচিত। বাবার কাছে অনেক হেল্প পাবি।

দাদা তারপর আর পিসিকে কোনোদিন ওপরে থাকতে বলেনি। শুধু আমাদের দুজনকে নিয়ে থাকবে বলে পিসি নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে আমল দেয়নি।

আমরা দুজন আজ দুদিকে। পিসি কি করে ভালো থাকে? তাই আমরা পিসির সাথে বেড়াতে যেতাম। খুব দুরে কোথাও নই, এদিক, ওদিক। পিসি বলত, চোখ, কান তৈরী হয়, বাইরে বের হলে। সারা শীতকাল, মিউজিয়াম, গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট, হুগলীর ইমামবাড়া বেড়াতে বেড়াতে কখন রাত্রি

হয়ে যেত, বুঝতে পারতামনা। বাড়ি ফিরে সেদিন কি কি দেখলাম, আমাদের জায়গাটা কেমন লাগল, লিখে পিসিকে দেখাতে হত। এতে আমাদের চিন্তাশক্তি, স্মরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অন্তত পিসির তাই মত ছিল। আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, আমরা আজ যা হয়েছি, সবই পিসির জন্য । দাদা হায়ার সেকেন্ডারীতে প্রথম ২০ জনের মধ্যে ছিল। তারপরে জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক করল। শেষের দিকে বাবা দাদাকে পড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে খুব সাহায্য করেছিল। বাবার একটা গুণ শেখার যোগ্য। অল্প কথাই কি চাইছেন সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।আমার রেজাল্ট দাদার মত না হলেও খুব খারাপ ছিলনা। আমাদের দুজনের চাকরির খবর শুনে বাবা, পিসি দুজনেই খুব খুশি হয়েছিল। আমরা চলে যাবার কয়েকদিন আগে থেকেই পিসির মুখ শুকনো। বাবা গম্ভীর। - চোখের আড়ালে যাচ্ছ, যাও। কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন কোরোনা। পিসি আমাদের দুজনকে পাশে বসিয়ে বলল - একটা লিস্ট করেছি। কি কি নিতে হবে দেখে নে। শেষে ---

দাদা বলল - আমি একটা করেছি। সব তো এক সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিছু ওখানে কিনে নিতে হবে।

- তনি তুই ? তুই তো এর আগে কোনোদিন একা থাকিস নি রে? পিসির গলায় হাহাকার।

আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। গলার মাঝখানে শক্ত কিছু যেন আটকে আছে। অনেক চেষ্টায় কান্না আঁটকে রাখি।

- বললাম, পিসি তোমাকে না দেখে আমি কি করে থাকব? আমার জীবনে সকাল হবে কি করে? দাদারে তোকে ছেড়েই বা থাকব কি করে? কার সাথে আমি মনের কথা, প্রাণের কথা বলব?
- সেরেছে তনি, তুই এখন ফ্যাঁচ, ফ্যাঁচ করে কাঁদতে বসিস না। ভীষন মেয়েলি হয়ে যাবে ব্যাপারটা।

চোখে জল, মুখে হাসি দুমদুম করে দাদার পিঠে দুঘা বসিয়ে দিই।

প্রথমকটা মাস আমাদের খুব কষ্ট হতো। রোজ কাঁদতাম পিসি, দাদা, আর বাবার কথা ভেবে। কিন্ত ফিরে যেতে তো পারিনি। এখানেই জীবন বয়ে চলেছে।

বাড়ীতে পোঁছে দেখি বাবা দরজার কাছে দাড়িঁয়ে আছেন। বাবাকে হঠাৎ খুব বয়স্ক লাগল। একবছরে এতটা পরিবর্ত্তন। নাকি আমার চোখের ভুল।

- বাবা, পিসি কেমন আছে?

- জ্বরটা নেই। তবে খুব দুর্বল। এসো, পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসলাম। দাদা বিছানার একপাশে পিসির একটা হাত হাতে নিয়ে বসে। আমার ঢোকাটা কেউ লক্ষ্য করেনি।

- দাদা কখন এলি?
- এই তো ঘন্টাদুই হলো।

পাশ ফিরে আমাকে দেখে চোখ বড় করে কিছু বলতে যাবার আগেই আগে আমি পিসিকে জড়িয়ে ধরলাম। ভুলে গেলাম একদিনের বাসি ট্রেনের জামাকাপড় আমার। পিসির চেহারা শীর্ণ হয়েছে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। মুখে হাসি। ভাগ্যিস জ্বর হয়েছিল তবেই না তোদের দেখা পেলাম। ডগডগে রং জ্বরে কিছুটা ফ্যাকাশে। সেই অবস্থায় আমাদের জন্য রান্নাঘরে যাচ্ছিল।

- তোমার না জ্বর? বলে দাদা হাত ধরে বিছানায় শুয়ে দিয়েছে।

দাদা আর আমি রাতের খাওয়া সেরে সামনের বারান্দায় বসে। বাবা আর পিসিরও খাওয় হয়ে গিয়েছে। ওদেরকে শুয়ে পড়তে বলেছি। পিসি আমাদের সাথে গল্প করতে চাইছিল। দাদা বলেছে, জ্বর সেরে গেলে আমরা সারাদিন, রাত গল্প করব। দুজনেই বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে হঠাৎ পিসি আর বাবা এই দুজন সবচেয়ে কাছের লোকের জন্য খুব কষ্ট হতে লাগল। মনে হল কি করছি দূরে থেকে দুটো পয়সার জন্য। দুটো প্রাণী এখানে আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

- কি ভাবছিস তনি? এত চুপচাপ?
- হ্যারে দাদা, কলকাতায় আমি কেমন চাকরি পেতে পারি রে?
- হঠাৎ কলকাতা কেন?
- ধর ফিরে এলাম। দিল্লী আর ভালো লাগছে না।
- যা বলেছিস। আমিও আর ব্যাঙ্গালোরে একা থাকতে পারছি না।
- তার মানে? তোর কি হয়েছে?
- কি আবার হবে?
- তা অবশ্য। আমাকে বলবিই বা কেন? কোথাকার কে একটা ছোট বোন।

দাদা হেসে ফেলে। - ফাজলামি রাখ। আমি ভাবছি কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে চলে আসবো।

- আর তোর অত দামী চাকরি?

- ধুত্তোর চাকরি। বাবা চাকরি করে। পিসিরও একটা আছে। তুই আমি কলকাতায় এলে বসে থাকব না। কিছু না কিছু একটা পাবই। বাড়ীতে চারজন লোকের চারজনই চাকরি করে। আর কত টাকা চাই আমাদের?
- দাদা - পিসি কিন্ত চেঁচামেচি করতে পারে চাকরি ছাড়লে।
- করুক। তুই আমার পাশে আছিস তো?
- ভীষণভাবে আছি।
- সত্যি কি পেয়েছি বল বাড়ির বাইরে থেকে। আমাদের ছোট ছোট আনন্দ, সুখ সব হারিয়ে গিয়েছে। বাইরের কর্ম্মজগৎটা এত জটিল। তার উপর তোদের কাউকে কাছে পাইনা। একেকসময় নিজেকে ক্লান্ত লাগে।

দাদাকে এত উদাস হতে আগে দেখিনি। ও তো সবসময় হালকা রসিকতা করে। এত গভীরভাবে ভাবল কখন? ওকে দেখে সম্ভ্রম জাগে।

- দাদা আমি এবার সত্যি বড় হয়েছি। এতদিনে পাত্তা দিলি।

দাদা অপ্রস্তুত চোখে তাকায়।

- তোর মনের এত কথা আমার সাথে শেয়ার করলি এই প্রথম। এতদিনে সাবালক হলাম বল।

দুজনেই হেসে ফেলি।

কথায় কথায় অনেক রাত্রি হয়ে গেল। দাদা মাথায় টোকা মেরে বলল

- শুতে যা, তনি। কাল সকালে পিসির সাথে ফাইট করতে হবে। ঘুমিয়ে গায়ের জোর বাড়া।
- তুই যা দাদা। আমি আর একটু বসি। আমার ভীষণ ভালো লাগছে। খুব হাওয়া দিচ্ছে।

আকাশও নির্মেঘ, পরিস্কার। পরিবেশটা হঠাৎ করেই যেন পালটে গেল। মনের মধ্যে কোকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছি। চর্তুদিকে রাধাচূড়া, পলাশ, রঙ্গনা আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই আলোর ঝর্ণায় আমরা ভেসে চলেছি। আমি, দাদা, পিসি, বাবা সবাই।

----------সমাপ্ত----------